৩

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 07 [illegible] 1998 ...
পৃঃ ৭ কলাম ৫......

স্ত্রী শিক্ষা বিস্তার ও বেগম রোকেয়া

■ মেরীনা চৌধুরী ■

মুসলিম সমাজের নারীবাদী আন্দোলনের এক উজ্জ্বল ধ্রুবতারা বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। উনিশ শতকের শেষার্ধে মুসলিম সমাজে মেয়েদের অসূর্যম্পর্শা ও অন্তঃপুরবাসিনী হয়েই জীবন কাটাতে হতো। সেই অবরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে থেকেও তিনি নারীর মানবাধিকার অর্জনের জন্য নেতৃত্ব দিয়েছেন। মুসলমান নারী সমাজের সর্বাঙ্গিন মুক্তিই ছিল তাঁর সারাজীবনের সাধনা। বাংলাদেশের নারী জাগরণের ইতিহাসে বেগম রোকেয়ার অবদান এক উজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে আছে। আজকের মুসলমান সমাজের মেয়েরা যতখানি আলোকপ্রাপ্ত তার সম্পূর্ণ গৌরব প্রাপ্য নারী আন্দোলনের বিস্ময়কর প্রতিভাদীপ্ত এক নারী– বেগম রোকেয়ার।

আজ আমার ভাবতে আশ্চর্য লাগে কি বিস্ময়কর বহুমুখী প্রতিভা ছিল সেকালের পর্দা প্রথায় অবরোধবাসিনী এই নারীর। যিনি নারী সমাজের সার্বিক উন্নতি এবং নারীমুক্তির জন্য যেমন নিরলস কাজ করেছেন তেমনি স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারও ছিল তাঁর অন্যতম লক্ষ্য। তিনি ছিলেন স্ত্রী-শিক্ষার অগ্রদূত।

১৮৮০ সালে রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার অন্তর্গত পায়রাবন্দ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন বেগম রোকেয়া। পিতা জহিরুদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের। মাতা- রাহাতন্নেছা সাবেরা চৌধুরাণী। পিতা-মাতার দিক থেকে উচ্চ বংশের অধিকারী ছিলেন রোকেয়া।

অজ পাড়াগাঁ পায়রাবান্দায় শৈশব জীবন কেমন কেটেছে সে সম্পর্কে রোকেয়া লিখেছেন, 'আমাদের এ নিবিড় অরণ্যবেষ্টিত বাড়ির তুলনা কোথায়? বাড়ির চতুর্দিকে গভীর বন, তাহাতে বাঘ, শূকর, শৃগাল– সবই আছে। আমাদের এখানে ঘড়ি নাই, সেজন্য আমাদের কোন কাজ আটকায় না। প্রভাতে ঘুঘু, বৌ কথা কও, ও খুকি ও খুকি, চোখ গেল প্রভৃতি পাখীর ভৈরবী আলাপে শয্যাত্যাগ করি। সন্ধ্যাকালে শৃগালের 'হুয়া হুয়া, ক্যায় হুয়া শব্দ শুনিয়া বুঝিতে পারি মাগরেবের নামাজের সময় হইয়াছে। রাত্রিকালে কুরুয়া পাখীর 'কা-অ্যাক-কা-আককু' ডাক শুনিয়া বুঝিতে পারি এখন রাত্রি তিনটা। আমাদের শৈশব জীবন পল্লীগ্রামের নিবিড় অরণ্যে পরম সুখে অতিবাহিত হইয়াছে, তবে ঘরের বাইরে বের হওয়া ছিল মেয়েদের জন্য নিষিদ্ধ।

রোকেয়ার পরিবারে পর্দা প্রথার খুবই কড়াকড়ি ছিল। পর্দার নামে, এক কথায় 'অবরোধ প্রথা' চালু ছিল। রোকেয়া নিজেই লিখেছেন শৈশব জীবনের সেই অভিজ্ঞতা– "অপরের কথা দূরে থাকুক! এখন নিজের কথা কিছু বলি। সবেমাত্র পাঁচ বৎসর বয়স হইতে আমাকে স্ত্রীলোকদের হইতেও পর্দা করিতে হইত। ছাই কিছুই বুঝিতাম না যে, কেন কাহারও সম্মুখে যাইতে নাই, অথচ পর্দা করিতে হইত।" সমাজের নানাবিধ কুসংস্কার, ধর্মের কাছে যুক্তিহীন অকুণ্ঠ প্রত্যাবর্তন, অশিক্ষা এবং ভয়াবহ অবরোধের বিভীষিকা– এসব রোকেয়া প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি অত্যন্ত বেদনায় লিখেছেনঃ

"কেন আসিলাম, হায়! এ পোড়া সংসারে
কেন জন্ম লভিলাম পর্দা-নশীন ঘরে।"

উনবিংশ শতাব্দীতে এই অবরোধ প্রথা মুসলমান নারী সমাজের সবরকম স্বাধীন বিকাশের পথ অবরুদ্ধ করেছিল। রোকেয়া এই অবরুদ্ধ নারীকে বলেছেন– 'Human luggage'। অত্যন্ত ক্ষোভে তিনি বলেছিলেন, "অবরোধ প্রথাকে একমাত্র প্রাণঘাতক কার্বলিক এ্যাসিড গ্যাসের সাথে তুলনা করা যায়। যেহেতু তাহাতে বিনা যন্ত্রণায় মৃত্যু হয় বলিয়া লোকে কার্বলিক গ্যাসের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করিবার অবসর পায় না। অবরোধবাসিনী নারী এই অবরোধ গ্যাসে বিনা ক্লেশে তিল তিল করিয়া নীরবে মরিতেছে।

পায়রাবন্দ জমিদার বাড়িতে এই ছিল মেয়েদের জীবন। সেই পরিবারে মেয়েদের লেখাপড়া শেখার সমস্ত রাস্তাও ছিল বন্ধ। রোকেয়ার পিতা মেয়েদের জন্য শুধু কোরানশরীফ পাঠ ছাড়া অন্য শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন না। লেখাপড়া শেখার বিষয়ে পিতার কাছ থেকে কোনও সাহায্য তিনি পাননি। তাই বাঙালি সমাজের দুর্ভাগা মেয়েদের মত রোকেয়াও কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেননি। বড় ভাই এবং বোনের কাছে, ঘরের অবরোধে পড়াশোনা শিখেছিলেন তিনি। মেয়েদের লেখাপড়া করার বিষয়টিকে ভালো চোখে দেখত না আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীরাও। তারা প্রায়শঃই বিদ্রূপ করে বলত, লেখাপড়া শিখিয়া মেয়ে জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হইবে। কিন্তু বড় ভাই ইব্রাহীম এবং বড় বোন করিমুন্নেসা ছিলেন অন্যরকম মানুষ। বোন শেখাতেন বাংলা, ভাই ইংরেজি। ভাই ইব্রাহীমের আস্থা ছিল ইংরেজির ওপর। তিনি বলতেন– এই ইংরেজি ভাষাটা শিখতে পারলে পৃথিবীর এক রত্ন ভান্ডারের দরজা খুলে যাবে। দিনের শেষে রাতের গভীর অন্ধকারে, বাড়ির লোকেরা যখন সবাই ঘুমাতে যেত সে সময় মোমবাতি জ্বালিয়ে ভাই-বোনের কাছে রোকেয়া পড়তে বসতেন।

আস্তে আস্তে রোকেয়া বড় হলেন। ১৬ বছর বয়সে ১৮৯৬ সালে ভাগলপুরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিয়ে হয় রোকেয়ার সৈয়দ সাখাওয়াৎ হোসেনের সাথে। তিনি ছিলেন উচ্চশিক্ষিত উদারমুক্ত মনের মানুষ। তাঁর সান্নিধ্য ও সাহচর্যেই উর্দু ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষ হন রোকেয়া। ১৯০৯ সালে সাখাওয়াৎ হোসেনের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে মুসলিম মেয়েদের শিক্ষার জন্য ১০ হাজার টাকা দান করেন এবং স্ত্রী বেগম রোকেয়ার নামেই একটি ট্রাষ্টিও ঠিক করেন। স্বামীর মৃত্যুর পাঁচ মাস পরে ১৯০৯-এর ১ অক্টোবর তিনি ভাগলপুরে একটি মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় ভাগলপুরে তিনি থাকতে পারলেন না, তাঁর স্বামীর প্রথমপক্ষের মেয়ে এবং জামাতার অত্যাচারে।

তিনি ভাগলপুর থেকে কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতায় এসে ১৯১১-র ২৬ মার্চ নতুন উদ্যমে ১৩নং ওয়ালিউল্লাহ লেনের একটি বাড়িতে "সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস হাইস্কুল" শুরু করে দেন। সেই স্কুলে আস্তে আস্তে মেয়েদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। তখন ১৩নং বাড়িতে আর স্থান সংকুলান হয় না। অতঃপর ১৬ নম্বর ইউরোপীয়ান অ্যাসাইলাম লেনে স্কুল সরিয়ে নেন। সেটা ১৯১৩-র ৯ মে মাসের ঘটনা। এরপর ১৯১৫-র ২৭ ফেব্রুয়ারি এই স্কুল ৮৬/এ লোয়ার সার্কুলার রোডে চলে যায়। পাঁচটি ক্লাস এবং ৭০ জন ছোট-বড় মেয়ে ছিল ছাত্রী। এছাড়া ছিল দুখানা গাড়ি, দুইজোড়া ঘোড়া, সহিস, কোচম্যান ইত্যাদি– সবদিকেই রোকেয়াকে দৃষ্টি দিতে হত। এমনকি "রোজ সন্ধ্যাবেলা সহিসেরা ঠিকমত ঘোড়া মলে কিনা তাও আমাকে দেখতে হতো।" এই ছিল রোকেয়ার উক্তি।

১৯৩০ সালে সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস হাইস্কুল একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। তিনি বলতেন "শিক্ষার অর্থ কোন সম্প্রদায় বা জাতি বিশেষের অন্ধ অনুকরণ নহে .... আমরা কেবল পাস করা শিক্ষাকে প্রকৃত শিক্ষা বলি না।"

সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুল স্থাপনের পেছনে ছিল রোকেয়ার আদর্শ আর অদম্য মনের জোর। স্কুলের একটা সমস্যা ছিল সে সময়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষিকার অভাব ছিল। ১৯১৯ সালে ইংরেজ সরকার একটি মুসলিম মহিলা ট্রেনিং স্কুল খোলে। যারা এখানে ট্রেনিংয়ের জন্য গিয়েছিলেন তাদের অধিকাংশই ছিলেন সাখাওয়াৎ স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রী।

১৯১৬ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর সরোজিনী নাইডু এক চিঠিতে রোকেয়াকে লেখেন– ".... কয়েক বৎসর হইতে দেখিতেছি আপনি কি দুঃসাহসের কাজ করিয়া চলিয়াছেন। মুসলমান বালিকাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য আপনি যে কাজ হাতে নিয়েছেন এবং তাহার সাফল্যের জন্য দীর্ঘকাল ব্যাপী যে ত্যাগ সাধনা করিয়া আসিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। .... আপনার এই ভগ্নী দূর হইতে বরাবর আপনাকে আদর্শকে এবং আপনার কর্মময় জীবনকে কিরূপ শ্রদ্ধার চোখে দেখিয়া থাকে তাহা জানাইবার জন্যই এই চিঠি।"

সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলে কীভাবে কাজ-কর্ম হবে, কীভাবে পড়াশুনা হবে, তা বুঝবার জন্য বেগম রোকেয়া দিনের পর দিন বেথুন এবং গোখলে মেমোরিয়াল স্কুলে গিয়ে বসে থাকতেন। পড়ার সময় ছাত্রীদের সঙ্গে ক্লাস রুমেও তাঁকে দেখা যেত। যেহেতু তাঁর বিদ্যালয়ে যাওয়া হয়নি, সুতরাং কোন অভিজ্ঞতা না থাকায় তিনি তা এভাবে সঞ্চয় করেন।

স্ত্রী-শিক্ষাকে তিনি বিচ্ছিন্নভাবে দেখেননি। একটা সামাজিক অবস্থা এবং শর্ত হিসেবেই দেখতেন এবং এর গুরুত্ব অনুভব করতেন। তিনি বলেছেন– 'স্ত্রী-শিক্ষার কথা বলিতে গেলেই আমাদের সামাজিক অবস্থার আলোচনা অনিবার্য হইয়া পড়ে। আর সামাজিক অবস্থার কথা বলিতে গেলে, নারীর প্রতি মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের অবহেলা, ঔদার্য্য এবং অনুদার ব্যবহারের প্রতি কটাক্ষপাত অনিবার্য হইয়া পড়ে। .... আমি আজ ২২ বৎসর হইতে ভারতের সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীবের জন্য রোদন করিতেছি। ... সে জীব ভারত নারী। এই জীবগুলির জন্য কখনও কাহারও প্রাণ কাঁদে নাই।"

তৎকালীন সমাজে নারীর প্রতি নানা অত্যাচার ও অসহিষ্ণুতা তাঁকে ক্ষুব্ধ ও বিদ্রোহী করে তুলেছিল। তাই আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়েই তিনি কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের বুকে নারী শিক্ষা প্রচারের ব্রত গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। তবে একথা সত্য যে–

বেগম রোকেয়ার সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলের কাজ খুব সহজে হয়নি। তাঁর চলার পথও সুগম ছিল না। অত্যন্ত দুর্গম পথে হেঁটেই তিনি বাংলার মুসলমান মেয়েদের জন্য একটা মসৃণ পথ তৈরিতে ব্রতী হয়েছিলেন। এই বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য অনেক অপমান-নিন্দা সহ্য করতে হয়েছে রোকেয়াকে। কলকাতা শহরে সেকালের গণ্যমান্য মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও ধনী ব্যক্তিরা বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে নানাবিধ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। প্রাণপ্রণ শত্রুতায় বিদ্যালয়ের চরম ক্ষতিসাধনে ব্রতী হন তাঁরা। ধর্মান্ধ মৌলবীরাও বেগম রোকেয়ার স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার, বিদ্যালয় স্থাপন– এই প্রচেষ্টাকে ধিক্কার দিয়েছিলেন। রোকেয়ার বিরুদ্ধে শত্রুদের প্রচার ছিল 'যুবতী-বিধবা স্কুল স্থাপন করিয়া নিজের রূপ-যৌবনের বিজ্ঞাপন প্রচার করিতেছেন।'

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ১৮ বছর পর রোকেয়ার অভিজ্ঞতা হয়। "আঠার বছর ধরিয়া এই গরীব স্কুলকে জীবনের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য কেবল সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। দেশের বড় বড় লোক– যাঁহাদের নাম উচ্চারণ করিতে রসনা গৌরববোধ করে, তাঁহারাও প্রাণপ্রণ শত্রুতা সাধন করিয়াছেন। স্কুলের বিরুদ্ধে কতদিকে কত প্রচার ষড়যন্ত্র চলিতেছে..... স্কুলটা যে এত ঝঞ্ঝাবাত, এত শিলা বৃষ্টি, এত অত্যাচার সহিয়া এখনও টিকিয়া আছে, তাহাই যথেষ্ট। এ কথা বলি না যে, আমরা সমাজের সম্মুখে অতি উচ্চদরের এক অদ্বিতীয় আদর্শ বিদ্যালয় উপস্থিত করিয়াছি। আমাদের ন্যায় অবরোধ বন্দিনীদের পক্ষে যতটা করা সম্ভব তাই করিয়াছি এবং অবরোধ বন্দিনী বালিকাদের পক্ষে যতটা শিক্ষা পাওয়া সম্ভব, তাহাই তাহারা পাইয়াছে।"

তিনি অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে বলিয়াছেন, "এই স্কুলটা না থাকলে আমার তিলমাত্র ক্ষতি নেই। তবে এ স্কুলের উন্নতি কেন চাই?– চাই নিজের সুখ্যাতি বাড়াবার জন্য নয়, চাই স্বামীর স্মৃতিরক্ষার জন্য নয়, চাই বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের কল্যাণের জন্য। সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল শব্দ দু'টির জন্য যদি স্কুলের অকল্যাণ হয়, তবে সাইন বোর্ড থেকে ওই শব্দ দু'টি মুছে ফেলা যাক। অবশ্য মুসলিম সমাজটাও টিকে থাকলে বা গোল্লায় গেলে আমার নিজের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। কারণ আমার কোন বংশধর নাই যে, তাদের ভাবী দু'দর্শার আশঙ্কায় আমি শঙ্কিত হব, কিংবা তাদের দুষ্ক্রিয়া দেখে আমি লজ্জিত হব। সুতরাং আপনারা বুঝিতে পারছেন, এই স্কুল সম্বন্ধে মাথা ব্যথায় আমার ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ নাই।"

সেকালে মুসলমান সমাজপতিদের প্রবল বাঁধা ও ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে এবং তা অদম্য মনোবল ও সাহসিকতার সঙ্গে মোকাবেলা করে বেগম রোকেয়া মুসলিম মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারে একা লড়াই চালিয়ে গেছেন। তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন, এই সমাজদেহের দু'টি চোখ– পুরুষ ও নারী। তিনি বলতেন– "আমরা সমাজেরই অর্ধভঙ্গঃ আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কিরূপে? কোন ব্যক্তির একপা বাঁধিয়া রাখিলে সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে? পুরুষদের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে– একই।" তিনি চাইতেন নারীরাও জ্ঞানে, শিক্ষায়, কাজে পুরুষদের মতই যোগ্য হয়ে উঠুক। তিনি বলতেন– "আমরা অকর্মণ্য পুতুল জীবন বহন করিবার জন্য সৃষ্টি হই নাই, একথা নিশ্চিত।"

১৮০০ সালের প্রথম দিকে অনেক মুসলিম সংগঠন গড়ে উঠেছিলো, কিন্তু সেইসব সংগঠন কখনও স্ত্রী শিক্ষার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়নি। বেগম রোকেয়া এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করেছিলেন। ১৮১৮তে তিনি লিখলেন–...... "দ্বার যে বন্ধ। গৃহে যে গৃহিণী, ধর্মে যে সহধর্মিনী, ভাবী বংশধরের যে জননী, ভবিষ্যৎ আশা-ভরসার যে রক্ষয়িত্রী ও পালনকর্ত্রী, তাহাকে সঙ্গে না লইলে আপনি গন্তব্যস্থানে পৌছাতে পারিবেন না...... না জাগিলে সব ভারত ললনা এ ভারত আর জাগিবে না। এখানে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন ধর্ম সম্প্রদায়ের গণ্ডী ছাড়িয়ে এই উপমহাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তবে তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য ছিল মুসলমান নারী সমাজের জাগরণে শিক্ষা বিস্তার। সেই লক্ষ্যে তিনি সফল। আজ মেয়েরা শুধু জজ-ব্যারিষ্টারেরই পদ অলংকৃত করেননি– সর্বক্ষেত্রে তাদের দৃপ্ত পদচারণায় মুখর।

মাত্র দু'খানা বেঞ্চ এবং আটজন ছাত্রী নিয়ে একটা ছোট বাড়িতে যে স্কুল খুলেছিলেন বেগম রোকেয়া, সেই স্কুল "শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে" একদিন কলকাতার একটা নাম করা স্কুলে পরিণত হল। বহু বছর পর্যন্ত সরকারী অনুদান থেকে বঞ্চিত ছিল স্কুলটি। নিজের সঞ্চিত অর্থ দিয়ে তিনি সেই ঘাটতি পূরণ করেছেন। অপরিসীম ধৈর্য, সহিষ্ণুতা এবং আদর্শের প্রতি বিশ্বস্ততা- বেগম রোকেয়ার এই শক্তির কাছে ধর্মান্ধদের, নিচ, অশিক্ষিত ইতরদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র পরাস্ত হয়। বেগম রোকেয়া জয়যুক্ত হন।

বেগম রোকেয়া শিক্ষার প্রদীপ হাতে সাধনার দুর্গম পথ অতিক্রম করে, এদেশের অবরোধের লৌহকারার অন্তরাল থেকে বন্দিনী নারীকে আত্ম-অধিকার আদায়ের জন্য বাইরের জগতে বেরিয়ে আসার যে পথ দেখিয়েছেন সেজন্য "বেগম রোকেয়া" একটি অবিস্মরণীয় নামরূপে চিহ্নিত। তাঁর সমগ্র জীবনের কর্মকান্ড এদেশের নারী সমাজের কাছে এক অনন্য আদর্শের প্রতীক হয়ে থাকবে। □